মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা ।। জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ২৭

নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র

তাহমিদাল জামি

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী
কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র তাহমিদাল জামি
NarirSuratnama Koyekoti ChinnoPotro Tahmidal Zami
প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮-এর পক্ষে জ্ঞানগঞ্জ ২৭ পুথি, নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৭০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

ভারতচন্দ্রের ভূত- ভবিষ্যৎ

'ভারতচন্দ্রের জন্ম যে বংশে, কবির জীবনী হইতে পাইয়াছি, তাহা ছিল সুচিরকাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে সমৃদ্ধ। স্বাভাবিক সংস্কারের উপর ভারতচন্দ্রের জীবনে ছিল বিশেষ শিক্ষা-সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গলা ও ফারসী। অষ্টাদশ শতকের বাংলার জীবনে ফারসী ও হিন্দী শিক্ষার প্রবাহ বিশেষ প্রবল, এবং তাহার সাক্ষ্য ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ফারসী ও সংস্কৃত শব্দের প্রাণধর্ম্ম একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। উভয়ের ভিতরের ঝঙ্কার বা দোলনের সাম্য নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের শিল্প-নৈপুণ্যের অদ্ভুত কৃতিত্ব এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির শব্দের অপূর্ব্ব মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপনে। কবির শব্দ নির্ব্বাচন এবং তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ-কুশলতায় তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ফারসী ও সংস্কৃত শব্দ একান্ত শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিয়াছে।' [1]

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়াংশে ভারতচন্দ্রের বিষয়বস্তুর উপযোগী সৃজনের উদ্দেশ্যে অবলীলাক্রমে ফারসী শব্দের প্রয়োগ করাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা।

'লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল ॥'

ভারতচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন:
'মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥'

পাদরি ওয়েঙ্গার ১৮৫০-এর ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় (ত্রয়োদশ খণ্ড) Popular Literature of Bengal নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যাতে ভারতচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা ছিল।[2] সে-প্রবন্ধে বলা হয়: বাংলার ভদ্রবিত্ত সমাজে, বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে, অন্নদামঙ্গল সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলাগ্রন্থ। তাঁর খানিক অংশ ছিল নিম্নরূপ –

' Impartiality compels us to acknowledge that the ro-mantic story is treated in a manner, which commands ad-miration, so far as the beauty of its language and the rich-ness of its descriptions are concerned, but its tendency is essentially and grossly immoral, and its perusal by native females must

1 কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., ডি. ফিল. প্রণীত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', মডার্ণ বুক এজেন্সী [পৃষ্ঠা, ৯১]

2 ক্যালকাটা রিভিউয়ে প্রকাশিত আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩১২ বৈশাখের 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'ভারত চন্দ্রের অশ্লীলতা' প্রবন্ধে ঐ লেখকের নামোল্লেখ করেছেন।

be injurious in the extreme. Both the hero and the heroine are, throughout, the objects of the writers admiration. Faith in Kali is, according to him, rewarded by the successful issue of their criminal undertakings. And the lascivious interviews between them are described, again and again, with diausting minuteness, and in the most glowing language. If ever vice has been decked out in gau-dy colours, and made to appear attractive, it has been in this novel. The study of it must destroy all purity of mind and yet it can not be doubted, that if any book is read by, and to, respectable Bengali females, this is it. But we must not forget that there are to be found in Calcutta European ladies, who can read with equal interest and delight the most licentious novels of the same stamp-a taste in them much more reprehensible than that of their Bengali sisters who admire Bidya and Sundar.'

১৮৫০ সালে পাদরি ওয়েঙ্গার, খৃস্টান-ভিক্টোরীয় পুরুষ পাদরি-হিসাবে স্বতঃই বলেছিলেন: 'প্রধানতঃ নীতিদুষ্ট-দেশীয় নারীগণ কর্তৃক এর পঠন চরম ক্ষতির কারণ।' নায়ক নায়িকার কামতাড়িত সাক্ষাৎকারগুলি বিতৃষ্ণাকর খুঁটিনাটির সঙ্গে পুনপুনঃ বর্ণিত হয়েছে যে টেক্সটে, তাঁর মনে হয়েছে, যে পাপ যদি কখনো জাঁকালো বর্ণবাহুল্যে চিত্রিত হয়ে অতি চিত্তাকর্ষক চেহারায় উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে তাও এই রচনাতেই হয়েছে। এর পঠন মনের সর্বপ্রকার পবিত্রতা নষ্ট করবেই করবে। অথচ একথাও নিঃসংশয় সত্য, যদি কোনো বই ভদ্রঘরের বাঙালি মহিলারা অবিরত পড়েন বা শোনেন, সেও এই বইটিই।'

ওয়েঙ্গার সাহেব, বাঙালি-অন্তঃপুরে উঁকি দেবার পরে 'স্বদেশবাসী' মহিলাদের নিভৃতকক্ষে, তাদের পাঠ অভ্যাসে দৃষ্টি-নিক্ষেপ না করে পারেন নি: তাঁর মতে,

'কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই, কলকাতায় এমন অনেক ইউরোপীয় মহিলা পাওয়া যাবে, যাঁরা একইপ্রকার আগ্রহ ও উল্লাসের সঙ্গে ইউজিন সু (Eugene Sue) প্রমুখ অনুরূপ চরিত্রের ফরাসী লেখকদের চরম কামুকতাপূর্ণ উপন্যাসগুলি পড়ে থাকেন। তাঁদের সেই রুচি, বিদ্যাসুন্দর-সমাদরকারিণী তাঁদের দেশীয় ভগিনীগণের রুচি অপেক্ষা অনেক বেশী নিন্দনীয়।'[3]

ঈশ্বর গুপ্তের 'ভারতচন্দ্র'-এর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ১৮৫৬-তে রাখালদাস হালদার (ডঃ সুকুমার সেনের বয়ানে ঈশ্বর গুপ্তের মতোই, তিনি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করেন) ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার প্রভূত নিন্দা করে বলেন - 'অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহৎ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না।'[4]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বেঙ্গলী লিটারেচর' (১৮৭১) প্রবন্ধটিতে ভারতচন্দ্রকে নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে

3 অনুবাদটি শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

4 রহস্য সন্দর্ভ, প্রথম পর্ব, সংবৎ ১৯২০, পৃঃ ১৩৯

বরখাস্ত করেছেন। তাঁর মতে, ঐ কাব্য পুনর্মুদ্রণের যোগ্য নয়।

তিনি লিখছেন - 'Bharat Chandra is chiefly known by his Vidya Sundara and his Annada Mangal. Neither work has much merit, though an exception' must be made in favour of the character of Hira, the flower-girl, a coarse but racy and vigorous portrait, not equalled by anything of its kind in Bengali. One other great distinction, however, must be accorded to Bharat Chandra. He is the father of modern Bengali. His versification, too, is very good, and it is the model followed by many distinguished poets of the present day, as for instance, Babu Ranga Lal Banerji. In the higher attributes of a poet, Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him. His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits him for republication at a time when Bengali readers are not all of the rougher sex'.[5]

বাংলাদেশে একটি অশ্লীলতা-নিবারণী সভা স্থাপিত হওয়ার প্রতিক্রিয়াতে বঙ্কিম 'অশ্লীলতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে তিনি বলেন:

'অশ্লীলতা বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা বাঙালির রহস্য, বাঙালির গালি, নিম্নশ্রেণীর বাঙালি-স্ত্রীলোকের কোন্দল, এবং বাঙালির যাত্রা, কবি-পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন। মুহূর্ত-জন্য বাঙালি-কৃষকের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দেখুন-বাঙালির প্রণীত যে সকল কাব্যগ্রন্থ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত, তাহা পাঠ করিয়া দেখুন। বাঙালির চরিত্রে অশ্লীলতার ন্যায় কোনো দোষই সর্বব্যাপী নহে।' [6]

কিন্তু, তৎকালীন জনপরিসরের কাছে এই ঔপনিবেশিক শ্লীল-অশ্লীলের মাপকাঠি একেবারেই গ্রহণীয় ছিলনা। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন – 'বাংলা লোকসংস্কৃতিতে-বিশেষ করে মেয়েদের কথায়, প্রবাদে, ছড়ায়-শরীর-সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ উল্লেখ, বা ব্যঞ্জনাত্মক রূপক ও উপমার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রামীণ বাঙালি মেয়েদের ভাষায় কিছু শব্দ-যা এখনও প্রচলিত-পুরোপুরি শরীর সংক্রান্ত। যেমন, 'ডবকা' (হৃষ্টপুষ্ট সোমত্ত মেয়ে); 'ঢোকা' (যে মেয়ের শরীর ক্ষয়িষ্ণু); 'টুমশী' (মোটা মহিলা); 'আঁটকুড়ি' (বন্ধ্যা মহিলা)। কিছু প্রবাদ রেচন-সম্পর্কিত-মলত্যাগ, মুত্রত্যাগ, ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিশেষ প্রসঙ্গে একটি পুরোনো মেয়েলি রসিকতা স্মরণীয়-

---

5 শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১০০-১০১

6 প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে পৌষ ১২৮০-তে বেরোয়। লেখকের নাম ছিল না। ভাষা রীতি দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলেই মনে হয়।

কপাল আমার বক্ত (মন্দভাগ্য)
শক্ত দেখে ভাতার নিলাম,
হাগে শুধু রক্ত।

এই জাতীয় scatological প্রবাদ সে-যুগে অনেক সময় সঙের মিছিলে রূপায়িত হত।' [7]

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এই গ্রহণযোগ্যতার সপক্ষেই বলেছিলেন- 'তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করিয়া গায়ে রক্ত,কাদা মাখিয়া মোষের মুণ্ডু মাথায় লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হইত। আর বৃদ্ধ পিতামহ তাহার সমবয়স্কি লোক, পুত্র পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান কবিত ইহাকে অপর কথায় খেউড় গান বলিত। তখনকার দিনে এ সবের প্রচলন ছিল এবং লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত।'[8]

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে, চৈত্র-সংক্রান্তির দিন, কলকাতার কাঁসারীপাড়া থেকে একটি সঙের মিছিল বার হয়; যেখানে একটি গান গাওয়া হয়েছিল যা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

'শহরে এক নূতন হুজুক উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই,
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা
বঙ্গদর্শন এর নেতা।'[9]

তাহমিদাল জামি বর্তমান পুঁথিতে প্রমাণ করে ছেড়েছেন, 'ভারতচন্দ্র ও তাঁর রাজা যে দুনিয়ায় বসবাস করতেন সেই দুনিয়ায় পারসিক, মোগলাই ও ভারতীয় গল্প-কাহিনী-পুরাণের নায়ক-নায়িকা, সন্তদরবেশ, জীনভূত সহ নানাবিধ চরিত্রের সমাবেশ ছিল। সে ছিল এক অন্য জমানা।' আজ যখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক, পশ্চিমা পৃথিবীতে সমাদৃত অধ্যাপক তিথি ভট্টাচার্যের Ghostly Past, Capitalist Presence - A Social History of Fear in Colonial Benga-এর মত গ্রন্থ পাঠ করি, তখন বুঝতে শিখি কিভাবে মামদো ভূতের গল্প দিয়ে মুসলমান 'অপর'কে নির্মাণ করেছে ভদ্রবিত্তরা। অশ্লীলতার অপবাদের বোঝা, ভৌতিক পরিসরের নাকচ হয়ে যাওয়া অথবা এই পুঁথিতেই উল্লেখিত কবলে' কামিনীর লুপ্ত হয়ে যাওয়া গান , এ সব আসলে ছিল প্রাক ঔপনিবেশিক বাংলাকে হাপিস করে দেওয়ার চক্কর। যাকে পরাজিত করেই তাহমিদাল জামি নিজের তত্ত্ব বিশ্বকে সাজিয়েছেন। বড় বাংলার পাঠককুল তাকে গ্রহণ করুন।

জ্ঞানগঞ্জের পক্ষে,

অত্রি ভট্টাচার্য

---

7 সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ২৬৪-২৬৫

8 মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, পৃ. ৩৪

9 বসন্তক, ২য় পর্ব, দশম সংখ্যা, ১৮৭৪।

নারীর সুরতনামা *কয়েকটি ছিন্নপত্র*

তাহমিদাল জামি

বাংলার ইতিহাসের পাতায় পাতায় যতজন পুরুষ ব্যক্তির নাম মিলবে — কাহ্নপা থেকে ভারতচন্দ্র বা আলাওল, শশাঙ্ক থেকে প্রতাপাদিত্য বা সিরাজউদ্দৌলা, অতীশ দীপঙ্কর থেকে শ্রীচৈতন্য বা আলাওল হক পাণ্ডভী — সে তুলনায় নারীর নাম নিতান্ত বিরল। যত নারীর নাম পাওয়া যায় তারা অধিকাংশই পুরুষের সূত্রে। খনা, চন্দ্রাবতী, বিনতবিবি এমন অনেক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তো আছেনই। কিংবা আছেন বাংলার সাহিত্য জুড়ে — মঙ্গলকাব্য বা গীতিকাসমূহে — অজস্র শক্তিশালী নারীচরিত্র, তবু পাথুরে নথিতথ্যের ইতিহাসের পাতায় পুরুষের গড়চরিত বা প্রোসোপোগ্রাফিই সুলভ। ফলে প্রাচীন বাংলার নারীকে চেনাজানার কিছু অসুবিধা জারি আছে। বলা বাহুল্য, শাশ্বত বাঙালি নারী-প্রকৃতি বা নারীর চিরণ্তন ধাত বলে কিছু নাই। ইতিহাসের নানা জমানায়, সমাজের নানা পরতে নারীর দশা ও অভিজ্ঞতার তালাশ করা যেতে পারে বড়জোর। সেই খোঁজ কেবল সোজাসরল ইতিহাসের রাজপথে পাওয়ার জো নাই। প্রথাগত ইতিহাসে যেমন নারীর উপস্থিতি সীমিত, তেমনি সাহিত্যে নারীভাবের উপস্থাপন প্রায়শ ছাঁচে ঢালা। ফলে ইতিহাসের সদর রাস্তায় নারীভাবের খোঁজ যতটুকু পাওয়া যায় তাতে পুরো নির্ভর করা মুশকিল। হয়তো বিবিধ হদ্দি-দশা বা লিমিনাল এক্সপেরিয়েন্সের ভেতর বাংলার নারীর নানা পরিস্থিতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। স্বপ্ন-ঘোর-ভ্রম-উন্মত্ততা-অধ্যাত্ম ও পতিতদশা — এরকম নানা হদ্দি-দশার ভেতরে বাংলায় নারীভাবের আপতিক সত্য সন্ধান করা যেতে পারে। এই লেখাটি তেমনই কিছু আপতিক দশাগত সত্যের প্রাথমিক ইশারা যোগাবে পাঠককে। এটি একক লেখা নয়, বরং তিনটি সংক্ষিপ্ত, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত লেখার সংকলন। প্রথম লেখাটিতে ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় নিদ্রামগ্ন নারীর স্বপ্নে খল পুরুষের হানাদারির চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অংশে নারীর সুফিত্ব বা মুসলমানি অধ্যাত্মবাদের চিহ্ন সন্ধান করা হয়েছে। আর তেসরা অংশে আঠার শতকের একটি আদিরসাত্মক কবিতায় স্বতন্তরা নারীর প্রেমের রসের আমলদারির ছবি ফুটে উঠেছে। এই তিন ছিন্নপত্রে কি কোন স্পষ্ট আদল ফুটে উঠল? কোন তাত্ত্বিক প্রস্তাবনার আবছা রূপরেখা কি দেখা দিল? মোটেই

না। এ লেখা কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন ইশারা ও রেখার আঁকিবুকি রেখে গেল— এমন আরও বিস্তর খোঁজখবর চালিয়ে গেলে হয়তো গভীর কোন তাত্ত্বিক রূপায়ণের কথা ভাবা যাবে।

১

আশেক জীন ও শঠ পুরুষ: ভারতচন্দ্র রায়ের দুটি কবিতা

বাংলার অতি বড় কবি ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে তিনি পোষাকবি হিশাবে থাকতেন ও অনেকানেক সুন্দর লিরিক ও কাহিনীকাব্য রচনা করে রাজার তোষণ করতেন। বাংলা কবিতার পাশাপাশি আরও নানা ভাষায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতায় রস আর বুদ্ধি দুইটা সমান দেখা যায়। তবে তাঁর কবিকৃতি বিচার করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। আমি তাঁর দুইটা কম আলোচিত লিরিক এখানে আলাপ করতে চাই। দুইটাই সরবরাহ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।

প্রথম কবিতাটা বহুভাষী। আজকাল যেমন র‍্যাপ গানে বাংলা হিন্দি ইংরেজি আরবি একসঙ্গে ঢুকে পড়ে, এই কবিতাটিতেও ভারতচন্দ্র কয়েক ভাষায় নিজের কাবিলতি প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাটির বাংলায় অনুবাদ আগে হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। নিচে মূল কবিতা ও আমার করা সহজ বাংলা তর্জমা দিলাম। কবিতাটির ফার্সি অংশগুলি সম্ভবত কবিবর ঈশ্বর গুপ্তও বুঝতে পারেন নি, তাই আমিই পাঠ উদ্ধার করলাম। গবেষক লিপিকা রায় আমাকে সংস্কৃত চরণের অনুবাদে সাহায্য করেছেন।

মূল কবিতার পাঠ

“শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর,
বায়দকে গোয়দ রুবর (باید که گوید روبرو),
কাতর দেখে আদর কর,
কাহে মর, রো রোয়কে (काहे मर रो रो के)।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা,
ছুঁ, লালা, চে রেমা (..؟؟. چه لاله چون),
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা,
মেট্টিমে কাহে শোয় কে (मिट्टी में काहे शो के)।।

যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি,
দর জানে মন আয়ৎ খোসি (در جان من ایاد خوشی),
আমার হৃদয়ে বসি,
প্রেম কর খোস হোয় কে (प्रेम कर खुश हो के)।।
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি,
ইয়াদৎ মমুদা যাঁ কোসি (یادتم آمده ز آنکسی),
আজ্ঞা কর মিলে বসি,
ভারত ফকিরি খোয়কে (भारत फकीरी खो के)।।

আমার বাংলা অনুবাদ

শ্যাম, ভাল প্রাণের স্বামী,
মুখোমুখি কও গো কথা
দেখে কাতর করো আদর।
কেন মরো কানতে কানতে?
ওই মুখটা চাঁদ জানি গো,
তুলিপ ফুলের সে কি (শোভা?)!
রাগান্বিতারে কইরো ক্ষমা।
কেন রইলা মাটিতে শুইয়া?
একটু যদি কও গো কথা,
জানে আমার আসবে খুশি।
আমার হৃদয়ে বসি,
প্রেম করো গো হইয়া খুশি।
অনেক অনেক কানছ তুমি।
মনে আসে খালি তারই স্মৃতি!
আজ্ঞা করো মিলে বসি,
ভারত ফকিরি হারায়ে (?)।

কবিতাটা দুর্দান্ত। আমার অনুমান হল, মানিনী রাধার মান ভাঙার পর তিনি আবার কৃষ্ণের পাল্টা-অভিমান ভাঙাতে এসেছেন, এরকম কোন কলহান্তরিতা নায়িকার পুনর্মিলনের সিকোয়েন্স ভেবে কবিতাটা লিখেছেন

ভারতচন্দ্র। আঙ্গিকের কেরামতি বিচার করলে, দরবারি কবিতায় যে অতিচালাকি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে রাজা বা সভামণ্ডলীকে খুশি করার তাগিদ থাকে তারই নজির সম্ভবত কবিতাখানি। তবে সেকালের সেই রাজার দরবার যে বহুভাষী বহুসাংস্কৃতিক এক পরিসর ছিল সেই সুরতহালও আমরা এই পদ্যের ভেতর পাই।

দ্বিতীয় কবিতাটা বাংলাতেই লেখা কিন্তু শিরোনাম ফার্সিতে। ঈশ্বর গুপ্তের থেকেই তুলে দিচ্ছি:

"করদ্রাফথ বর্ণন।

করদ্রাফথ । - এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা একর্ম্ম হইয়াছে এবং কে একর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চপদী

কামিনী যামিনী মুখে নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফথ।।
নিদ্রা হতে উঠে নারী, অলসে অবশে ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি,
চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি,
ভাবে ভাল্ কর্দ্দোরফথ।।"

গুপ্তকবি শব্দের অর্থটা একটুখানি টসকেছেন। আদতে "করদ ও রাফত" মানে "করল আর ভাগল"— ভারতচন্দ্র এখানে এমন এক শঠের কথা বলেছেন যে নিদ্রিতাকে এসে চুম্বন ইত্যাদি করে পলায়ন করেছে। এই শঠ কি মানুষের বাচ্চা নাকি জীনের বাচ্চা? মানুষ হওয়া খুবই সম্ভব। Somnophilia বলে একধরণের যৌনবিকার আছে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিদ্রিতের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে। নিদ্রিতের প্রতি প্রণয়ের প্রকাশকে রোমান্টিসাইজ করারও চল আছে, যথা নজরুলের গানে আছে:

"রহিব যখন মগন ঘুমে
যেয়ো নীরবে নয়ন চুমে -
মধুকর আসে যেমন গোপনে

মল্লিকা চামেলী বনে।।”

কিংবা

“মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর...
শিয়রে বসি চুপিচুপি চুমিলে নয়ন
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম ।।”

নিদ্রাগামিনী নারীর পাশে একটি জীন

তবে ভারতচন্দ্রের কবিতায় শঠ এরকম কোন মনোহর স্বপ্নপুরুষ নয়, বরং এক এবিউজিভ ট্রান্সগ্রেসর বা নাফরমান। কারদ ও রাফত শব্দটা অনেকটা খেলারামগিরিই যেন প্রকাশ করে। সৈয়দ হকের “খেলারাম খেলে যা” উপন্যাস স্মর্তব্য।

তবে ভারতচন্দ্রের এই শঠ যদি মানুষ না হয়ে জীনের বাচ্চা হয় সেটাও অসম্ভব কল্পনা নয়। ইসলামি জীনতত্ত্ব অনুসারে নিদ্রাকালে আগত আশিক জীন মূলত ইনকিউবাস/সাকিউবাস ধারণার সমান্তরাল। জালালউদ্দিন সুয়ুতি সহ অনেকেই বলেন জীন-পরীরা অদৃশ্য বা দৃশ্য ভাবে প্রিয় নারী বা পুরুষের সাথে নিদ্রায় বা জাগরণে মিলিত হতে পারে, যার নানা আলামত পরিদৃশ্যমান হয় সেই প্রিয়পাত্র বা পাত্রীর মধ্যে। মুসলমানি, ভারতীয়, প্যাগান ও খ্রিস্টীয় পুরাণে স্বপ্নে জীন বা অমানুষিক আত্মার সঙ্গে মোলাকাত বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। নিদ্রাকালীন এই ইনকিউবাস, সাকিউবাস, আশিক জীন, বোবায়-ধরা

দি নাইটমেয়ার, আঁরি ফুসেলি

ইত্যাদি যে স্লিপ প্যারালাইসিস ও হ্যালুসিনেশন এ নিয়ে মনোবিদেরা বিস্তর লেখালেখি করেছেন। তেমনি মনোবিদেরা জাগরণে দেখা জীনের দলকেও মানবীয় দশার নানাবিধ লক্ষণ বা সিম্পটম হিসাবেই বিশ্লেষণ করেন। এটা সাইন্স।

আবার এমনও হতে পারে এই শঠ মানুষও না, জীনও না, বরং এমন এক দুঃস্বপ্ন বা সুখস্বপ্ন, যা নায়িকার auto-affection-এর একটা ধরণ।

কবিতার এই "শঠ" মানুষ না জীন নাকি নায়িকার নিজেরই বাসনাবিহ্বল কল্পনা -- এই সংশয় নিরসন না হলেও এই তিন রকম সম্ভাবনাই যে মনো-সামাজিক বাস্তবতায় বিরাজ করে, তা আমলে নিলে আমরা আজকালকার রুকইয়া ব্যবসায়ের মনো-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেকখানি বুঝতে পারব। বস্তুত, করদোরাফত একপ্রকার হানাদারির নাম। যে অভিজ্ঞতা আপনার মনকে হন্ট করে, যে ট্রমা বা দাগা আপনার মনকে নিদ্র-বিনিদ্র প্রহরে এসে আক্রান্ত করে, সেই হানাদারি অভিজ্ঞতাই এই করদোরাফত পদ্যের ভেতর ভারতচন্দ্র তুলে ধরেছেন।

আপাতত বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। বরং সংযুক্ত ছবি দুটি দেখুন। ইরানের ইস্ফাহানে ১৯০৬ সালের একটা বইয়ে সংযুক্ত একটা ছবি। নিদ্রাগামিনী নারীর পাশে একটি জীন। দ্বিতীয় ছবিটার নাম দি নাইটমেয়ার, শিল্পী আঁরি ফুসেলির আঁকা (১৭৮১)। দুই ছবির একটি অলৌকিকতায়, আর অন্যটি মনস্তাত্ত্বিকতায় জোর দিচ্ছে।

ভারতচন্দ্র ও তাঁর রাজা যে দুনিয়ায় বসবাস করতেন সেই দুনিয়ায় পারসিক, মোগলাই ও ভারতীয় গল্প-কাহিনী-পুরাণের নায়ক-নায়িকা, সন্ত-দরবেশ, জীনভূত সহ নানাবিধ চরিত্রের সমাবেশ ছিল। সে ছিল এক অন্য জমানা।

২

বাংলার নারী ও সুফি, অথবা "নারী সুফি"

বাংলার ইতিহাসে নারী সুফি কি আছেন? নাকি নাই? ইতিহাস ব্যবসায়ীরা মাথা কণ্ডূয়ন করে বলবেন, নাই। কিংবা ভেবে পাচ্ছি না। আচ্ছা, রোসো! এখানে দুইটা বিপরীত অনুমান বলি।

অনুমান এক, পুরুষতন্ত্র নারীদের সুফি হতে দেয় নাই, কিংবা সব নারী সুফির নাম মুছে ফেলেছে।

অনুমান দুই, নারীরা সুফিবাদে অংশ নিয়েছেন, এবং ঠিকই নিজেদের নাম লিখে রেখে গেছেন কোথাও।

প্রথম অনুমান ধরে আগাই প্রথমে। পুরুষতন্ত্র নারী সুফিদের নাম ধামাচাপা দিতে পারে বটে, কিন্তু আমরা তো আসলে দুনিয়ার অধিকাংশ পুরুষ সুফির নামও জানি না। বেশির ভাগ পুরুষ সুফির স্মৃতিও লোকসমাজে জারি থাকে নি, হারিয়ে গেছে। খালক্ব বা জনসমাজে নামযশ এড়িয়ে চলাটা সুফি গুণাবলির অন্যতম, অতএব বহু সুফির মধ্যে নিজের হাজিরা মুছে ফেলার একটা তাগিদ থাকত। যাঁদের নাম আমরা সুফি হিসাবে জানি তাঁরা হয় নিজেরা লেখালেখি করতেন, কিংবা তাঁদের সামাজিক উপস্থিতির সাক্ষ্য নিয়ে অন্য কেউ লেখালেখি করেছে। মালফুজাত বা বচনামৃত, মাক্তুবাত বা রচনামৃত, তাজকিরাত বা পবিত্রজীবন, সিলসিলা ও শাজারা, গজল বা রুবাই — এরকম নানা প্রকরণের লেখনের মধ্য দিয়ে একেকজন সুফির স্মৃতি সংবাহিত হয়ে এসেছে।

যেমন ধরা যাক খাস বিবি বা "আবেদা" ফাৎযাল যাদা নামক এক নারীর স্মৃতি। আবেদা মানে এবাদতপরায়ণা। গিরীন্দ্রণাথ দাস লিখেছেন যে খাসবিবি ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খাঁর আমলে ভারতে এসেছিলেন। দিল্লিতে সম্রাট আকবরের আমলে খাসবিবির জন্ম হয়। এরপর মানসিংহ যখন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে আসেন, তখন খাসবিবি সে অভিযানে সহযাত্রী হন। বাংলাদেশে এসে খাসবিবি বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার খাসপুর গ্রামে অবস্থান করেন। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর নামে লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি মঞ্জুর হয়। গিরীন্দ্রণাথের সাক্ষ্যে, খাসবিবি আবদুল গফুর সিদ্দিকীর বংশীয় পূর্বনারী। এই নারীর পুণ্যস্মৃতি বাদশাহি আমল ছাপিয়ে আধুনিক জমানাতেও জারি থাকতে দেখেছেন গিরীন্দ্রণাথ। "পীরানী খাষবিবির দরগাহে সেবায়েতগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। ভক্ত জনসাধারণ সেখানে হাজত মানত শিরণি দেন। পীরোত্তর হিসাবে প্রায় দুই বিঘা জমি পতিত আছে। তাঁর নাম মহিমার জন্য গ্রামের নাম হয়েছিল খাষপুর। স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্তই তাঁর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদশন করেন। তিনি ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচারের সহায়ক মানবদরদী ক্রিয়াকলাপের

জন্য আজো স্মরণীয় হয়ে আছেন।"

এত লিখেও পরিশেষে গিরীন্দ্রণাথ লিখেছেন যে, "তিনি যে সুফী মতাবলম্বী ছিলেন এবং সেই মতবাদ প্রচার করেছিলেন এমন কোন প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ দরগাহ থাকলেও এবং পুণ্যবতী হিসাবে লাখেরাজের বরাদ্দ পেলেও, খাসবিবির নিজস্ব স্বরটি কোথাও সেভাবে হাজির আছে বলে গিরিশ দেখেন নি। খাসবিবিকে লোকে আবেদা ও পীরানি বলছেন, কিন্তু তিনি মানুষটি কি ছিলেন? তিনি কি সুফি ছিলেন? লোকে যারে সুফি বলে সেই কি সুফি হয়? বাংলার ইতিহাসে - অসীম রায় ও রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন - অনেক সামরিক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি বা কল্পিত চরিত্রকে উত্তরকালের লোকে পীর বানিয়েছেন। অসীম রায় একে বলেন পীরিফিকেশন বা পীরায়ন। এই পীরায়নের ক্ষেত্রে - ইতিহাসের খাসবিবি কিংবা লোককথার বনবিবিকে বাদ দিলে - পীরায়িত নারীর সংখ্যা আসলেই কম। তাইলে পুরুষতন্ত্র হয়তো আসলেই নারী সুফির নাম মুছে ফেলেছে? নাকি নারীরা সুফিই হতে পারেন নি? বাংলার সমাজের আম কিংবা এলিট নারীর পক্ষে পীরায়িত হওয়া - এবং পীর হিসাবে তাঁদের স্মৃতির সংবহন - কতটুকু সম্ভব ছিল? উপনিবেশপূর্ব যুগে লেখন-সংস্কৃতির পরিসরে নারীর উপস্থিতি আমরা সীমিতই পাই। উপনিবেশপূর্ব বাংলার ইতিহাসে মুসলমান নারী কবির সংখ্যা হিন্দু নারী কবির মতোই বিরল।

কিন্তু এবার আসেন দ্বিতীয় অনুমানে। অধ্যাত্মপ্রবণ মুসলমান নারীরা কি নিজেদের চিহ্ন রেখে যান নাই কোথাও না কোথাও? যাওয়ারই তো কথা। প্রমথ চৌধুরীর একটা উক্তি স্মরণ করিঃ "বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন শুধু মেয়েরা - তাও পূর্ববঙ্গের"। পূর্ববঙ্গ বাদই দেন। পুরা বাংলাই না হয় হিসাব করি। ইংরেজ জমানায় রাসসুন্দরী বলেন, হানা মুলেন্স বলেন, বাংলা লেখালেখিতে নারীর পুরোধাগিরির নমুনা কম না। ফলে নারী সুফির চিহ্ন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। একটা আন্দাজ করিঃ মুসলমান নারী লেখক যেখানে পাব, মুসলমান নারী সুফিও তার আশেপাশেই পাব, কারণ লেখা ছাড়া তো স্মৃতি জারি থাকে না। হাফিজ-রুমি-জামি যেমন সুফিকুলে উচ্চঠাঁই পেয়েছেন লেখার গুণে।

দেখা যাচ্ছে, আমাদের এই আন্দাজ ঠিক। উপনিবেশপূর্ব বাংলার ইতিহাসে প্রথম যে নারী কবি আবিষ্কৃত হন তাঁর নাম রহিমন্নিচা (জন্ম ১৭৬০-১৮০০, মৃত্যু অজ্ঞাত)। পঞ্চাশের দশকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রহিমন্নিচার

প্রতি সুধীসমাজের - পুং সুধীসমাজের - দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রহিমন্নিচা সুফি বংশীয় ছিলেন, "শাস্ত্র" শিখেছিলেন, ছিলেন ধার্মিক ও ভাবপ্রবণ মানুষ, এবং বিস্তর লেখালেখির চর্চা করতেন। এতগুণে গুণী রহিমন্নিচাকে সুফিভাবাপন্ন নারী বললে আশা করি খুব বেশি দোষ হবে না। রহিম নিজেকে অবশ্য সুফি বলেন নাই, কিন্তু যে ব্যাটা বা বেটি নিজেকে সুফি বলে দাবি করেন তাঁর সুফিত্ব নিয়ে সন্দেহ করাও একেবারে পাপ বলা যায় না, কারণ পরমের সাপেক্ষে নিজের সত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সুফিবাদের এক মৌলিক মুদ্রা। ফলে রহিম নিজেকে সুফী শায়খা বা পীরানি বলে রটনা করেন নি এই যুক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা ঠিক হবে না।

নবাবি আমলে বাংলা বিহার উড়িষ্যা যখন একত্র ছিল, রহিমন্নিচার দাদা তখন ছিলেন মুঙ্গেরের সম্ভ্রান্ত মুসলমান। আরবের কোরাইশ বংশীয় অভিবাসী তাঁরা সে অঞ্চলে। মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হলে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তিনি চট্টগ্রামে অভিবাসন করেন। সেখানে জংলী শাহ নামে তিনি মানুষকে দীক্ষাদান করতে শুরু করেন। আখেরি মোগল আমলের প্রচলন অনুসারে তিনি চার তরিকায় খেলাফত দান করতেন। তাঁর পুত্র আবদুল কাদেরও "ছুপি খানদানে" সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও বহু লোককে শিষ্যত্ব দান করেন। তিন পুত্র ও এক কন্যাকে রেখে কাদের যখন মারা যান তখন রহিমের বয়স অতি কম। বাবাহারা অনাথা রহিম হেসেখেলে কাল গোঞাইতে লাগলেন। তখন তাঁর মা আলিমন্নিচা - যিনি "অনুপম গুণে"র অধিকারিণী ছিলেন - রহিমন্নিচার শিক্ষার ভার নিলেন, শাস্ত্রপাট শেখালেন। বয়সকালে এক সুরসিক বিদ্বান পুরুষের সাথে রহিমের বিবাহ হল। কিন্তু বিধি বাম। রহিমের ভাগ্য ছিল আজন্ম বিড়ম্বিত। রহিমের জীবনে প্রথমে বাপ, তারপর ছোট ভাই এবং পরিশেষে স্বামীর বিয়োগ ঘটে। একের পর এক এই তীব্র শোকাবহ ঘটনা, এই উন্মূলতার বোধ রহিমকে হয়তো মরজগৎ ও জীবন নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল।

পুরুষ কবিরা যেমন নিজেদের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতৃপরিচয়, গুরুপরিচয় ও পোষ্টাপরিচয়ে গুরুত্ব দিতেন, রহিমন্নিচাও নিজ পিতা, স্বামী ও গুরুর পরিচয় দিয়েছেন সবিস্তারে। এর পেছনে লেখক হিসাবে নিজেকে পরিচয় করানোর পাশাপাশি নিজের নারীসত্তার সম্ভ্রান্ততা নির্দেশ করার প্রেরণাও থাকতে পারে। নারীশ্রেষ্ঠত্ববাদী নন রহিমন্নিচা, বরং নারী হীন, এই কথা যখন তিনি বলেছেন - "স্থিরি জাতি হিনমতি" - সেটা রেটরিকাল

আত্মনিন্দা নয়, বরং নারীর বুদ্ধি কম, এই প্রাচীন এরিস্টটলীয় ধারণারই পুনরুৎপাদন। পুরুষের সাপেক্ষেই - পিতা ও স্বামীর সাপেক্ষে - নিজের কুলগৌরব চিহ্নিত করেছেন রহিম।

তবু রহিমন্নিচার জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব খুবই লক্ষণীয়। বিধবা আলিমন্নিচা পুত্রদের পাশাপাশি কন্যাকেও শাস্ত্রপাট শেখানোর বন্দোবস্ত করেছেন। অবশ্য পিতা থেকে পুত্রক্রমে যেভাবে সুফি সিলসিলার পরম্পরা সংবাহিত হয়, আলিমন্নিচা থেকে রহিমন্নিচার শিক্ষাদীক্ষার অনুরূপ কোন সিলসিলায়ন ঘটে নি। মাতা-দুহিতার এই সিলসিলা কোন স্বতন্ত্র নারী শাজারার জন্ম দেয় নি। তাছাড়া রহিমের বাপ যেমন চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে খেলাফত দিতেন, রহিমের পক্ষে তেমন ঘুরে ঘুরে বা আমদরবার বসিয়ে শিষ্যসামন্তের বিস্তার করা হয়তো সম্ভব ছিল না। শিক্ষিত নারী হিসাবে কি এলাকার নারীদের তিনি উপদেশ-নসিহত দিতেন? ক্লাসিকাল ইসলামের যুগে বসরার শাবাকা ছিলেন এক নারী যাঁর বাড়িতে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নারীরা একত্র হয়ে তপস্যা, কৃচ্ছ্রতা করত। তেমন কোন নারী জমায়েত কি হতো আলিমন্নিচা বা রহিমন্নিচার বাড়িতে? কে বলতে পারে? বাংলার নারীদেরও তো ছিল নিজস্ব সামাজিকতা, সামাজিক পরিসর, লেনদেন, জ্ঞানকাণ্ড-পরম্পরা-সংবহন। সহি বাত, তবে নারীস্বাতন্ত্র্যের ধারণাকেও অতিশায়িত করা ঠিক হবে না। নারীলেখন বা ecriture feminine একটা ধাতবাদী ধারণা। নারী লেখক নিজের কথা কেবল নারীর ভাষায় নারীকেই বলতে চায় তা নয়। শোকসন্তাপে ভরা রহিমন্নিচার জীবন এবং তাঁর লেখালেখি জুড়েই আছে আত্মজৈবনিকতা। এবং এই আত্মজৈবনিকতার লেখক ও কাংক্ষিত পাঠক কেবলই নারী নয়, বরং মানুষ বান্দা, তথা Dasein। প্রমথ চৌধুরীর উক্তিটি ফিরে ভাবলে প্রশ্ন আসে, স্বকক্ষবিচ্যুত বা শোকসন্তপ্ত নারীর অভিব্যক্তির একটি রাস্তাই কি তাঁদের আত্মজৈবনিকতার উৎস?

বলার মতো তেমন কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেন নি রহিম। তিনি আলাওল ও বাহরাম খাঁর কাব্যের অনুলেখন করেছিলেন। তারই মধ্যে তিনি জুড়েছিলেন নিজের আত্মবিবরণী - যার দরুন - খোদা মেহেরবান - তাঁর অসামান্য জীবনকাহিনীটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। রহিম আরও লিখেছিলেন নিজ ভাই আবদুল গফুরের মৃত্যুশোকে ভারাতুর একটি বারমাস্যা। ভাইয়ের শোকে লেখা রহিমের এই বারমাস্যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র জিনিস। মধ্যকালীন বাংলায় বারমাস্যা সাধারণত প্রিয়ের বিরহে প্রিয়ার

হাহাকার প্রকাশ করত, কিন্তু রহিমন্নিচার বারমাস্যাটিকে এনামুল হক একটি এলিজি বা শোকসঙ্গীত বলে অভিহিত করেছেন। এনামুল হকের বরাতে আরও জানা যায়, আত্মবিবরণী ও বারমাস্যা বাদে রহিমের তৃতীয় কবিতা হল "দোরদানা-বিলাপ", যেখানে দোরদানা নামক এক কন্যাকে পতেঙ্গায় বিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পরেই স্বামীর নির্যাতনে কন্যাটি নিহত হন। গৃহহিংসায় নিহত কন্যার জন্য তাঁর বাপ-মা-ভাই-বোনের যে বিলাপ তাই কবিতার প্রতিপাদ্য।

রহিমের যে ভাবগত মেজাজ, সেটার সাথে যদি আরবদেশের ক্লাসিকাল নারী সুফিদের তুলনা করি, তাইলে দেখব সেকালের আরব নারী সুফিরা উপাসনা ও কৃচ্ছ্রতা, প্রেমমত্ততা (মাহাব্বা), ভয় (খাওফ), ইত্যাদি ভাবাবেগের চর্চা করতেন। করতেন দাস্যভাবের (তাআব্বুদ) চর্চা । বিলাপ (বুকা) তথা ঈশ্বরস্মরণে বা জিকরে কান্নাকাটি করাটাও ছিল অন্যতম চর্চা। আর দেখুন, রহিমের আত্মঅনুভব জুড়ে আছে শোকসন্তাপ এবং দীন-অনুচ্চভাবঃ "মুই হিন তিরি জাতি", "মুই অতি খিনমতি দুক্ষিত তাপিত", "ছিরিমতি খুদ্র অতি রহিম ন্যিচা নাম", "মুই হত অভাগিনি", "হিনখিন অল্পজ্ঞান মুই কলঙ্কিনি", ইত্যাদি। নিজেকে ব্যজনিন্দায় "দুষ্ট কলংকিনী" আখ্যায়িত করা রহিমের আধ্যাত্মিক আকাংক্ষার মধ্যে আছে পতিভক্তি ও সতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার মধ্য দিয়ে "সতীর সমাজে" স্থান পাওয়া, এবং নবীর চরণে নিস্তার লাভ করা।

রহিমন্নিচা স্বমহিমায় ভাস্বর। তবু তাঁর রচনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে হয়তো তিনি বিখ্যাত পুরুষ লেখকের রচনা কপি করেছিলেন বলেই। যদি একেবারেই নিজের দস্তখতের উপর নির্ভর করতেন রহিম, জানি না কতদূর তা সংবাহিত হতো।

রহিমন্নিচার যুগের কিছু পরের আরেকটি উদাহরণ দিই। শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চলের মহাপুরুষ হাছন রাজা। তাঁর সৎবোন ছিলেন ছহিফা বানু বা হাজী বানু (১৮৫৪-১৯১২)। ১৯০৭ সালে তাঁর কবিতা-সংকলন "ছহিফা সঙ্গীত" প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সকল গীতে ইসলামি, বৈষ্ণব, ইত্যাদি পরিভাষা হাজির। তাঁর লেখা একটি গীত এমনঃ

সুবল, যা রে বৃন্দাবন
দেখে আস গে রাধারাণী আছেরে কেমন॥
মথুরাতে আছি আমি পাগল আমার মন,

রাধার জন্য সদা আমার প্রাণ উচাটন॥
রাধার পদে ধরে সুবল করিস নিবেদন,
দিবানিশি রাধা প্যারী আছেরে স্মরণ॥
রাধার প্রেমে আছি বান্ধা জন্মের মতন,
শীঘ্র গিয়ে দেখব আমি ঐ রাঙ্গা চরণ॥
মথুরাতে আছি আমি হইয়ে রাজন,
রাধার খেদে ত্যজ্য করব রাজসিংহাসন॥
ছহিফায় বলে শুন ভুবনমোহন,
কুব্জার কুবুদ্ধিয়ে তুমি হয়েছ বন্ধন॥

পরমের সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক কৃষ্ণ ও রাধার রূপকে ধরেছেন ছহিফা। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস মাথায় রাখলে এহেন রূপকায়ন কোন আজগুবি ব্যাপার বলে মনে হবে না। বিদূষী আয়েশা ইরানি মুসলমান-সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কোন মুসলমান কবির পক্ষে রাধাকৃষ্ণের পদ লেখা সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমার বুঝমতে, সেটা বিলক্ষণ সম্ভব। আবার পণ্ডিতবর টনি কে স্টুয়ার্ট তর্ক তুলেছিলেন যে রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বৈষ্ণব পরিভাষা ব্যবহার করার মানে সমন্বয়বাদ (সিনক্রেটিজম) নয়, বরং এটা মুসলমান মিশনারি কবিদের দ্বারা বাংলার আম শ্রোতামণ্ডলীর পরিচিত পরিভাষা ব্যবহারের দ্বারা ইসলাম প্রচার। আমার মতে ব্যাপারটা অমন সরল নয়। পুরাতন বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরকম লেনাদেনা আদতেই এক ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতার চিহ্ন।

ব্যাপারটা বোঝাতে, শ্রীহট্টনিবাসিনী শিক্ষিতা, বড়লোকের কন্যা ছহিফা বানুর রাধাকৃষ্ণ পদের পাশে আমি স্থাপন করব সুন্দরবনের কাছাকাছি জাপুসা গ্রামের পোদ জাতীয় এক নিরক্ষর বাঙালি নারীর ভাব-গীতি। এই নারীর নাম জানা যায় না, তবে তিনি "কবেল কামিনী" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর জীবনকাল। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, কবেলের ভাগ্নে তারাচাঁদ, গাজী গীতের দল নিয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন, এবং নিজ গুরু হিসাবে মাসির কথা স্মরণ করতেন। কবেলের প্রতিভার সার্টিফিকেট প্রসঙ্গে লোকে বলত, "একদিন প্রাতে অমাবস্যা তিথিতে কবেল-বেটী একটী মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের "বিরাট" নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল,

সেই সময় তাহার মুখে "শ্যামাসঙ্গীত" শুনিয়া নিজে নাকি জগজ্জননী শ্যামা তাহাকে "কবেল" উপাধিতে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।" দেখা যাচ্ছে, কবেল যে আরবি শব্দ, তাতে শ্যামা মায়ের এই উপাধি আমল করতে আটকায় নি। তো এই পোদকন্যা কবেল বেটি কেবল শ্যামা বা রাধার গান বাঁধতেন না, তিনি গাজীপীরের গানও বাঁধতেন। একটি ভণিতা এমনঃ

"পরগণে হোগলার মধ্যি গ্রাম জাপুসা।
গীত গড়িয়ে গারস্তালি করে কবেল মা।।"

খুব একটা বোঝা গেল না মোক্ষদাচরণের দেওয়া এই উদাহরণ থেকে। যে মুখে-মুখে ছড়ানো গাজীর গীতের আর্কাইভে কবেল বেটি নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছিলেন, সেটা ভদ্রলোকেরা ততটা সংরক্ষণ হয়তো করে উঠতে পারেন নি। ফলে কবেল বেটির মুখে রচিত গাজীপীরের গান কেমন ছিল সে পরিচয় আমার বিস্তারিত জানা নাই। তবু নারী সুফির আলাপে পোদবংশীয় কবেল বেটির আলাপ টানলাম এই কারণে যে বাংলার আমসমাজে গাজীপীর বনবিবি ইত্যাকার যে পীরবাদের আমল হয়, সেখানে নারীর সৃষ্টিশীল অংশগ্রহণ ছিল, এবং উপনিবেশ-আমলে গঠিতব্য "হিন্দু সমাজে"র নিচুজাতের নারীও এই চিত্ররূপময়-সাকারবাদী-কাহিনীনির্ভর অধ্যাত্ম সাহিত্যে দুই ফোঁটা শিশির ট্রিবিউট দিতেন বৈকি! শিশিরের এই রূপককে কেউ ফ্যালোসেন্ট্রিক ভাবতে চাইলে ভাবুন। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, গাজীর কাহিনী সুফীবাদ তথা ইসলামের ভাবসম্পদেরই রূপবিশেষ।

আর্কাইভ বা চিহ্নশালায় নিজের স্বাক্ষর আলগোছে রেখে যাওয়ার ফলে এমন কিছু নারীর খবর আমরা জানতে পেরেছি। আরেক ধরণের স্বাক্ষর ছিল মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে, তার শিলালিপিতে নিজের নাম জারি করা। পুরুষ সুফিদের পাবলিক ধর্মকর্মের এক বড় অংশ যেমন ছিল সমাজ বা কমিউনিটি প্রতিষ্ঠার নানা উদ্যোগ - তা চাষবাস, মসজিদ-মাদ্রাসা, কিংবা যুদ্ধ, যার মধ্য দিয়েই হোক, তেমনি পুণ্যপ্রত্যাশী নারীরাও সমাজ গঠনের পরিসরিক আমল হিসাবে নানা রকম স্থাপনা কর্মে জড়াতেন বলে জল্পনা করা যায়। বিনত বিবি কিংবা মালতী, সুলতানি আমলে এই ধারার সূচনা করেন বটে, তবে আখেরি-আঠার শতক এবং উনিশ শতকে এই ধারা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অনেকানেক সম্পদশালী নারী ধর্মীয় স্থাপনা কায়েম করেন — শিলালিপিতে নয়তো জনশ্রুতিতে তাঁদের নাম আমরা

পাই। এইসকল শিলালিপিতে প্রায়ই পাওয়া যায় অধ্যাত্মবোধের সুমিত অভিব্যক্তি। যেমন ১৮৭০ সালে নবাবগঞ্জের বক্তারপুরের সাহেববাড়ির মসজিদটি ফয়জুন্নেসা নামক ধনাঢ্য নারী নির্মাণ করেছিলেন, এবং তার কারণ হিসাবে শিলালিপিতে লেখাঃ "স্বর্গলোকের ভাগীদার হতে অকপট বিশ্বাসে, বানালেন প্রেমময় মসজিদ একখানা, যেন দিনে পঞ্চবার অনন্তের পানে প্রার্থনার দ্বারা চিরকল্যাণের সাধন হয় পাকা।" (আমার পাঠ ও অনুবাদ-চেষ্টা)। কথাগুলোর মধ্যে সুফিবাদের শাস্ত্রীয় বা পারিভাষিক চিহ্ন নেই। তবে আছে আধ্যাত্মিক বোধ, প্রেম, এবং সমাজ গঠনের উদ্যোগ।

উপরের এই ছাড়া-ছাড়া আলোচনার উদ্দেশ্য জোর করে এটা প্রমাণ করা নয় যে নারীদের মধ্যেও পুরুষের সমান বড় বড় সুফি ছিলেন। নারীর পক্ষে কি তরিকতের পীর হওয়া সম্ভব ছিল? কিংবা মনসুর হাল্লাজ বা সারমাদের মতো ফকির হয়ে জালালি জুনুনের (সাবলাইম ম্যাডনেস) আমল করা কি নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল? জানি না। সুফি পরিচয়ের যে প্রকাশ্য লীলাময়তা (পাবলিক, পারফরমেটিভ দিক) সেটা আমল করার ক্ষেত্রে নারীদের যেমন জোরদার অংশগ্রহণ ছিল, আবার বাধানিষেধও ছিল - যেমন দিল্লির ফিরুজ শাহ তুঘলক নারীদের মাজার গমন নিষিদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ সুফিবাদের প্রকাশ্য লীলাময়তার আমলে নারীরা একটু বেশি অসুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। মোটকথা বাংলায় অনেক বড় বড় নারী সুফি ছিলেন এটা আমার বক্তব্য নয়। বরং ইতিহাসে সুফিবাদের আমল বোঝার পদ্ধতির দিক থেকেই আমার বিবেচনা হল এই যে, মহাপুরুষকেন্দ্রিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সুফিবাদকে প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বুঝতে হলে তার চিহ্নতন্ত্র, পরিসরিক আমল, স্মৃতি-বিস্মৃতি-নির্মিতি ইত্যাদি বিবেচনা করা জরুরি। নারী সুফিদের ইতিহাস আমরা জানি না বটে, কিন্তু সম্ভবত উপরোক্ত পদ্ধতিতেই রুহানি চর্চায় নারীর অংশগ্রহণকে বোঝার কাজে প্রথম পা বাড়ানো সম্ভব।

৩

নষ্টামো কথাঃ প্রাক-উপনিবেশি বাংলার এরোটিকা

ফরাশি পাঠাগারে রক্ষিত ১৭৮৫ সালে সংগৃহীত একটি পুথিতে একটি আদিরসের চটি কবিতা বা এরোটিক নকশা-পদ্য পাওয়া যায়। কুবিরণাথ

বলে এক অপরিজ্ঞাত কবির লেখা গুটিকয় পাতার এই চটিপুথিটি ফরাশি কোম্পানির লোকেরা সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, কিন্তু এর কোন পাঠোদ্ধার বা প্রকাশ ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমরা জানি না। কেন এই পুরাতন, বিধিবহির্ভূত কবিতার পাঠোদ্ধার? যেকোন সমাজের এক হদিস মেলে তার হদ্দিতে, তার নীতি-কানুন-প্রথা ও স্বাভাবিকতার সীমানায়। সেই বিচারে এই ধরণের সাহিত্যের একটা ইতিহাসতাত্ত্বিক গুরুত্ব তো আছেই। এমনকি নীতিশাস্ত্রীয় গুরুত্বও আছে।

কবিতাটির আদিপাঠ

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ (?)

আমী একলা বিকেলবেলা বসেছিলাম বায়ঃ
হেনসময় একটা মেএ সেইখান দিএ জায়ঃ
লইতন সেখা হাতেঃ কাঁকন তাতে সোবা পেএচে করঃ
টাউপৈচে কসনকোসা গয়না কলাবরঃ
আর কপালে পেটেঃ কানে গেঁটেঃ। গলায় তেনলিঃ
মোহনমালা চন্দ্রহার আর সবে চাঁপকলিঃ
আ তার বরণ গুরেঃ পবন ডুরে তায় জরির আচলঃ
মুখ্যানি পঞ্চিমের চাঁদ দন্তগুলি ছোলঃ
দন্ত দেখিতে ভালোঃ কালকাল তায় কি বলব সে যলিঃ
মোনে করি কালো মেঘে পড়িচে বিজলিঃ
কীবল রবির প্রায় বুঝা যায় মোর মোনে লেগেচেঃ
কেমন বিরলে তারে বিধাতা গড়েচেঃ
কীবল ননি জিনি তনুখানি অতি সুখময়ঃ
তপ্তকাঞ্চন রূপ করে তনতনঃ
আহা মরি কী বা য়াভা কীবা সোবা কী বা তার চামঃ
চাইতে চীতে চেতন হরে রুপে কান্দে কামঃ
আ তার বুকের মাঝে ডালি সাজে দির্ব্ব স্তন দুটাঃ
কোন কুদাঁরি কুদেঁচে কিম্বা বিনোদিয়া কাটাঃ
তাঁহর সিংহ জিনি মাজাখানি ধত্তে পারি কড়েঃ
চলে জেতে কোমরখানি লজর গজর করেঃ

দুখানি পাচা ভারি চলমাধুরি জিনি হংসরাজেঃ
চলে জেতে পাএর ঘুঙ্গুর ঝুনুর ঝুনুর বাজে
আওায গুজীরি সাজেঃ তার কাছে ধে কমল পঞ্চম
চাত্তিবের (?) পুত্তলি কেবল দেখে হলাম ভ্রমঃ
অমিনি থাকীলাম চেএঃ ভেক হয়ে মোনে ভাবি ভোরঃ
তার সঙ্গে ছিল এক বুড়ি করিল ইসারাঃ
বুঝি এহার কুটানি সতেঃ ইসারাতে জিজ্ঞাসিলাম জাইএঃ
মাঁগী বলে খেলাড়ু বটে গন্দবেনের মেএঃ
কীন্তু রসিক বড় বুজিএ দড় গেলাম তড়াতরি
দরজার দরয়ানি তার বালাখানা বাড়িঃ
দেখে কীছু সন্দ হলোঃ দিবস গেল রাত্র উপনিতঃ
হেনকালে কুতুহলে হইলাম অতিতঃ
গ্রস্তরা বাড়িতে আছঃ বড়টী (?) পাঁচ সব্দ করি বারে
হেনসময় দরানি মিনিসে মোরে জিজ্ঞাসা করেঃ
কোতা হইতে আইলেঃ মোরে বলে বুঝিএ তার রিতঃ
এখানকার নই মুই বৈদিসি অতিতঃ
আজি এইখানে রবঃ বুঝিয়া ভাব দরানি এলো কাছেঃ
অতিত সালে বসো গিএ সপ পাতা রএছেঃ
মোরে সেদে মিএ দিয়েঃ দরানি ভেএ তিনি গেল বাড়িঃ
প্রহরখেনেক রেত পর এলো এক বুড়িঃ
গোচারি সিদা লইয়েঃ কাচে থুএ ঘরে গেল বুড়িঃ
বেঞ্জনু (?) কেবল পাচটা মাসকলাএর বড়িঃ
অমনি ছেচতামেচতা ২ বড়িপোড়া গোচারি খেলাম রেন্দেঃ
এই দুঃখ সুমু রব তার চাঁদবদনে চুদেঃ
যদি মোর ভাগ্য থাকে ২ পাই তাহাকে এহো মোর সওকঃ
ত্রিসুত চাতক প্রায় রাতি হল তিনপ্রহরঃ
মোর কী নিদ্রা য়াছেঃ ২ তারি পীছে মোন পড়েচে জায়েঃ
হেনসময় চন্দ্রমুখি এলো বাহির হএঃ

ধিরি২ আমার কাছে ২ আসিয়া পুছেঃ জাগ নাহে ঘুম
হুকরিতে গালের ওপর চুমার ওপর চুমঃ
অমনি আবেস করে ২ হাতি ধরে বসাইনু খাটেঃ
নড়েচড়ে কাপড় ফুড়ে মস্ত মেড়া ওটেঃ
অমনি নড়েচড়ে ২ কাপড় ফাড়ে করে চড়২
ছুড়ি বলে বিলম্ব কেন লাগায়লা পক্কড়ঃ
অমিনি জাপট্যে ধরে দিনু ভরে ছোট গুদের গাড়াঃ
তিনদমকে সেন্দেইল অর্দ্ধখানি বাড়াঃ
আর অর্দ্ধেক জাগে নাহিক লাগে করে চড়চড়ঃ
ছুড়ি বলে খুব করে লাগায়লা পক্কড়ঃ
অমনি দিলাম পুরেঃ ২ আবেস করে লাগীল কাপে কাপঃ
বরগীর বেগার জেমন চাপের ওপর চাপঃ
অমনি তাপর ২ গাপুর গুপুর পড়ি সে ওর মাঝেঃ
চাপ মারিতে পাএর ঘুঙ্গুর ঝুনুর ২ বাজে
বড় সুনিতে মজা ২ ছুড়ি বাঁজা বেড়ে গেল হেপ
লাগিল রমবাদ্য চাডুমবাডুবব হোতা
রাতি পোহালোঃ ২ রম হলো দিতে চাই টেকাঃ
তেখেন টাকা দেখে ছুড়ি মুকট করে বেঁকা (বাঁকা)ঃ
তেখন ছুড়ি কয় ২ মহাসয় কহি তোমার চাইঃ
আনের পারা তেমন মোরা টাকার ভুক নইঃ
কীবল পীরিতের মরাঃ প্রেমে ভরা থাকা রাত্রদেনেঃ
আমি রসিক লএ রস করিব ধনে কায্য কীবাঃ
সদাইরসপ্রেমে হেনসময় কপাটে ধেলে ঘাঃ
ওটো ওটো ২ বল্যা ডাকীচে বড়জাঃ
তখন ছুড়ি কয় মহাসয় জাবে কেমন করেঃ
চল লএ রাখি তোমায় সিন্দুকেতে ভরেঃ
বড় নিগম চাই ভয় নাই চাবি দিল এটেঃ
আমি লাজে গলি (?) ঠেকীলাম কোন সঁকচান্নির হাতেঃ

আপন ইর্ছাসুকে একাসিন্দুকে থাকী পড়ে পড়েঃ
দিবস হলে বাহির করে খায়ায় দুদ চীড়েঃ
মিঠাইমণ্ডা দিএ গ্র*এ (?) খেএ গাএ হইল বলঃ
ভোজন সেসে ফের খায়ালে ডাবনরিকেলের জল
বড় হইলাম টাণ্ডা উটলে বাণ্ডা (?) গা করে চীঞ্চিঃ
রমনরঙ্গে তাঁর সঙ্গে গেল তেরদিনঃ
দীলে চণ্ডে খেএঃ ওরে ভে কোস্ট গেল এঁটেঃ
আমি মোনে করি চুপি চুপি এঁমিনি পালাই ছুটেঃ
তখন কহিলাম পস্টঃ হইয়া ওস্ট সুন রসমইঃ
আজি জাই মুই ফের আসিব দিন পাঁচ ছয় বইঃ
তখন কয়াজাগেঃ দুই এঁকে পড়ে প্রেমধারাঃ
বসিলে উটীতে নারে জেমন মাঁতয়ারাঃ
একী সর্ব্বনাস পরের আস হইলাম বাড়ির বাহিরঃ
বাহির হইয়া সতবার ভাবি সত্য পিরঃ
সত সেলাম দিএ ঘরে গীএ কবিতে বসাইঃ
তেরদিন কার সঙ্গে দেখা সুনা নাঞিঃ
কহে কুবিরণাতেঃ বাবুভেএঁয় খুব খপরদারঃ
অতিকামে লোবব্ধ হইলে এই য়াবস্তা তারঃ
তোমরা বুজে চোদঃ নস্টাম কথা এবং স্ত্রিলোকের বর্ণনা ইতি ৭ মাঘ

হালের মান বাংলায় কবিতাটির রূপান্তরঃ

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ (?)
আমি একলা বিকেলবেলা বসেছিলাম বায়।
হেন সময় একটা মেয়ে সেখান দিয়ে যায়।।
লইতন (নতুন?) সেখা হাতে কাঁকন তাতে শোভা পেয়েছে কর।
টাউ (?) পইছা কসনকোসা (?) গয়না কলেবর।।
আর কপালে পেটে কানে গেঁটে গলায় তেনলি।
মোহনমালা চন্দ্রহার আর সবে চাঁপাকলি।।

আ(হা) তার বরণ গোরা, পবন ডুরে তায় জরির আঁচল।
মুখখানি পঞ্চমীর চাঁদ দাঁতগুলো ছোল (?)।।
দাঁত দেখতে ভাল, কাল কাল তায় কি বলব সে জুলি (?)।
মনে করি কাল মেঘে পড়ছে বিজলি।।
কেবল রবির প্রায়, বোঝা যায় মোর মনে লেগেছে।
কেমন বিরলে তারে বিধাতা গড়েছে।।
কেবল ননি জিনি তনুখানি অতি সুখময়।
তপ্তকাঞ্চন রূপ করে টনটন।।
আহা মরি কি বা আভা! কি বা শোভা! কি বা তার চাম!
চাইতে চিতে চেতন হরে, রূপে কাঁদে কাম।।
আ(হা) তার বুকের মাঝে ডালি সাজে দিব্য স্তন দুটা।
কোন কুদাঁরি কুদেঁছে কিবা বিনোদিয়া কাটা।।
তার সিংহ জিনি মাজাখানি ধরতে পারি করে।
চলে যেতে কোমরখানি লজর-গজর করে।।
দুখানি পাছা ভারি চলমাধুরি জিনি হংসরাজে।
চলে যেতে পায়ের ঘুঙ্গুর ঝুনুর ঝুনুর বাজে।।
আওয়াজ গুজীরি সাজে, তার কাছে ধে (?) কমল পঞ্চম।
চাত্তিবের (?) পুত্তলি কেবল দেখে হলাম ভ্রম।।
অমনি থাকলাম চেয়ে ভেক হয়ে মনে ভাবি (বি)ভোর।
তার সঙ্গে ছিল এক বুড়ি করিল ইশারা।
বুঝি এর কুটনি সতীন, ইশারাতে জিজ্ঞাসিলাম যেয়ে।
মাগী বলে খেলাড়ু বটে গন্ধবেনের মেয়ে।।
কিন্তু রসিক বড়, বুঝে দড় গেলাম তাড়াতাড়ি।
দরজার দারোয়ান, তার বালাখানা বাড়ি!
দেখে কিছু সন্দেহ হল, দিবস গেল, রাত্রি উপনীত।
হেনকালে কুতূহলে হলাম অতিথি।
'গৃহস্থরা বাড়িতে আছ', বড়টী (?) পাঁচ শব্দ করি বাইরে।
হেন সময় দারোয়ান মিনসে মোরে জিজ্ঞাসা করে,

"কোথা হতে এলে", মোরে বলে। বুঝি এ তার রীতি।"
"এখানকার নই আমি বিদেশি অতিথি।।
আজ এখানে রব।" বুঝে ভাব দারোয়ান এল কাছে।
"অতিথিশালায় বসো গিয়ে সব পাতা রয়েছে।"
মোরে সেধে মেয়ে দিয়ে, দারোয়ান ভায়া তিনি গেলেন বাড়ি।
প্রহরখানেক রাতের পর এল এক বুড়ি।
গোচারি সিধা (?) লয়ে কাছে থুয়ে ঘরে গেল বুড়ি।
বেঞ্জু (?) কেবল পাঁচটা মাসকলাইয়ের বড়ি।
অমনি ছেচতামেচতা বড়ি পোড়া গোচারি খেলাম রেঁধে।
এই দুঃখ সয়ে রব তার চাঁদবদনে চুদে।।
যদি মোর ভাগ্য থাকে পাই তাকে এই মোর শখ।
তৃষিত চাতক প্রায় রাত হল তিনপ্রহর।
মোর কি নিদ্রা আছে? তারই পিছে মন পড়েছে গিয়ে।
হেন সময় চন্দ্রমুখি এল বের হয়ে।।
ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে পুছে, "জাগো, নাই ঘুম।"
হু করতে গালের ওপর চুমার ওপর চুম।।
অমনি আবেশ করে হাত ধরে বসালাম খাটে।
নড়েচড়ে কাপড় ফুঁড়ে মস্ত মেড়া (?) ওঠে।।
অমনি নড়েচড়ে কাপড় ফাঁড়ে করে চড়চড়।
ছুড়ি বলে, "বিলম্ব কেন? লাগাও পাকড়।'
অমনি জাপটে ধরে দিলাম ভরে ছোট গুদের গাড়া।
তিন দমকে সিঁধাল আধাখানি বাড়া।।
আর অর্ধেক যাচ্ছে না তো করে চড়চড়।
ছুড়ি বলে, "খুব করে লাগাও পাকড়।।"
অমনি দিলাম পুরে, আবেশ করে লাগল খাপে খাপ।
বর্গীর বেগার যেমন, চাপের ওপর চাপ।।
অমনি তাপর-তাপর গাপুর-গুপুর পড়ি সে ওর মাঝে।
চাপ মারতে পায়ের ঘুঙ্গুর ঝুনুর ঝুনুর বাজে।।

বড় শুনতে মজা, ছুড়ি বাঁজা, বেড়ে গেল হেপ (?)।
লাগল রম্য বাদ্য চাডুমবাডুবব হোতা (?)
রাত পোহাল রমণ হল, দিতে চাইলাম টাকা।
তখন টাকা দেখে ছুড়ি মুখটা করে বাঁকা।।
তখন ছুড়ি কয়, "মহাশয়, বলি তোমার কাছে।
অন্যের পারা তেমন মোরা টাকার লোভী নই।।
কেবল পিরিতের মরা, প্রেমে ভরা থাকা রাত্রিদিনে।
আমি রসিক লয়ে রস করব, ধনে কার্য কি বা?
সদাই রসপ্রেমে।" হেন সময় কপাটে দিল ঘা।
"ওঠো ওঠো", বলে ডাকছে বড় জা।।
তখন ছুড়ি কয়, "মহাশয়, যাবে কেমন করে?
চল নিয়ে রাখি তোমায় সিন্দুকেতে ভরে।।"
বড় নির্গমন চাই, ভয় নাই চাবি দিল এঁটে।
আমি লাজে গলি, ঠেকলাম কোন শাকচুন্নির হাতে?
আপন ইচ্ছাসুখে একা সিন্দুকে থাকি পড়ে পড়ে।
দিবস হলে বের করে খাওয়ায় দুধচিড়ে।।
মিঠাইমণ্ডা দিয়ে খাবার খেয়ে গায়ে হল বল।
ভোজন শেষে ফের খাওয়াল ডাব-নারিকেলের জল।।
বড় হলাম ঠাণ্ডা উঠল বাণ্ডা (?), গা করে চিনচিন।
রমণরঙ্গে তার সঙ্গে গেল তেরদিন।।
দিল চটকে/চণ্ডি খেয়ে, ওরে ভায়া, কষ্ট গেল এঁটে।
আমি মনে করি চুপিচুপি এমনি পালাই ছুটে।।
তখন কইলাম স্পষ্ট, হয়ে অতিষ্ঠ, "শোন রসময়ী।
আজ যাই, আমি ফের আসব দিন পাঁচ ছয় বাদে।।"
তখন "কাহাঁ জায়েঙ্গে?" দুই এঁকে পড়ে প্রেমধারা,
বসলে উঠতে নারে যেন মাতোয়ারা।।
একি সর্ব্বনাশ! পরের আস (?) হলাম বাড়ির বাহির।
বের হয়ে শতবার ভাবি সত্যপীর।।

শত সালাম দিয়ে ঘরে গিয়ে কবিতা বসাই।
তের দিন কারো সঙ্গে দেখাশোনা নাই।।
কয় কবীরণাথে, বাবুভায়া খুব খবরদার,
অতিকামে লুব্ধ হলে এই অবস্থা তার।।
তোমরা বুঝে চোদো। নষ্টামি কথা এবং স্ত্রীলোকের বর্ণনা।
ইতি ৭ মাঘ।।

সূত্র:

Kubirnath. “Strīlokera varṇanā.” 1801-1900. Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Indien 717. Mukherjee, Prithwindra. 1983.“Catalogue du Fonds Bengali.” Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient 72: 13-48

জোড়াপাতা উত্তরকথন

বিশ্বেন্দু নন্দ

১০০ বছর পরও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাগারের পরিকল্পনায় নতুন করে ফোর্টউইলিয়াম কালেজে পাঠ্য বই হিসেবে ছাপা হচ্ছে এবং বিদ্যাসাগর, বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে যে ৬০০ টাকা কর্জ করে চালু ছাপাখানা কিনবেন, নাম হবে সংস্কৃত ডিপোজিটারি প্রেস - সেই ইতিহাস লিখেছেন দুই প্রজন্মের দুই বিদ্যাসাগর চর্চক, বিনয় ঘোষ (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, তিন খণ্ডে) এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী (বিদ্যাসাগর নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুনর্ণির্মাণের আখ্যান)। পাঠকের জন্য একই প্রসঙ্গের দুটো আলাদা বয়ান তুলে দিলাম। আমরা যারা অন্য ধরণের বিদ্যাসাগর এবং নবজাগরণী কলকাতার বাঙালি সমাজকে জেনেছি বিনয় ঘোষ সূত্রে, সেই জ্ঞানের নতুন প্রেক্ষিত, নতুন পাদপূরণ এবং নতুন ভ্রমনিরসন করছেন দেবোত্তম চক্রবর্তী লকডাউন পর্বে প্রকাশিত বইতে।

দুটি বই থেকেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাব বিদ্যাসাগর মশাই-এর ছাপাখানার বিনিয়োগ জোগাড়, ছাপাখানা কেনার আর্থিক দায় মেটাতে 'মধ্যযুগীয়' বই, অন্নদামঙ্গল আবির্ভূত হচ্ছে উদ্ধারকারীর ভূমিকায়, চোখ কপালে তোলা দাম ট্যাগে। অন্নদামঙ্গল পড়ানোয় ঈশ্বরচন্দ্রের অস্বস্তি কেন দেবোত্তম তাঁর বইতে উল্লেখ করলেন না, উত্তরে আমায় শিশির কুমার দাসের সাহেবস এন্ড মুনসিজ সূত্র ধরে জানিয়েছেন, 'যে কালেজে ছাত্রের সংখ্যা শূন্য, সেখানে বিদ্যাসাগর মশাই-এর অন্নদামঙ্গল পড়ানোর প্রসঙ্গটাই অবান্তর, তাই আমি প্রসঙ্গটাই এড়িয়েগিয়েছি।'

ইন্টারেস্টিং হল, বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর পড়েছি প্রায় তিরিশ বছর আগে, আমার শুধুই মনেছিল অন্নদামঙ্গলের অত্যাশ্চর্য দাম ৬ টাকা, আর তাঁর পড়ানোকালের অস্বস্তির প্রসঙ্গ। আজ আবার ২৭ নম্বর পুথির উত্তরকথন উপস্থিত করতে গিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করলাম, বিদ্যাসাগর মশাই অন্নদামঙ্গল পড়াতে অস্বস্তি বোধ করতেন ঠিকই, কিন্তু অন্নদামঙ্গলের গুণও গাইতেন। অন্নদামঙ্গল প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা!'

যেন ভুলে না যাই নবজাগরণের অগ্রপথিকেরা লুঠেরা, গণহত্যাকারী সাম্রাজ্যের দয়ায় বিখ্যাত হয়েছেন, চাকরি করেছেন, দালালি করেছেন আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত কোলাবরেটরেরা চাকরি-ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছেন। উপনিবেশ বিদ্যাসাগর মশাই-এর ছাপাখানায় বিনিয়োগের অর্থ ৬ টাকা দরে ১০০ অন্নদামঙ্গল কিনে শোধ করার ব্যবস্থা করে নি, ছাপাখানা যাতে বাধাহীন চলে, প্রতিটা নতুন বইএর পিছনে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বিনিয়োজিত প্রতিটা মুদ্রা যাতে উদ্ধার হয়, তার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আর সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি প্রত্যেকটা বই নির্দিষ্ট সংখ্যায় কিনেছে। শম্ভুচন্দ্রে ভাষায়, 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল।'

জ্ঞানগঞ্জ উৎসা পট্টনায়েক সূত্রে ১৩তম পুথি অনন্ত লুঠের বাখান-এ দেখিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৯০ বছরে ১২৯৩০.৫৪ ট্রিলিয়ন পাউন্ড লুঠ করেছে। সেই লুঠের অংশীদার প্রত্যেক সাম্রাজ্যবন্ধু ভদ্রবিত্ত নবজাগরণী। জনগণের রক্তচোষা সেই লুঠের অর্থ থেকেই বিদ্যাসাগর মশাইএর ছাপাখানার পৃষ্ঠপোষকতা, এ কথা যেন হকার-চাষী-কারিগরের রাজনীতি করা একজনও কর্মী ভুলে না যাই।

উপনিবেশের পতন হোক।

১

বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, খণ্ড তিন

ছাপাখানা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ সঞ্চয় করা তখন মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সামান্য চাকরি করে, বিরাট পোষ্যসংখ্যা প্রতিপালন করে, অর্থসঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না। ঋণ করে তাই শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা করতে হয়েছিল। এ-সম্বন্ধে তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: '

এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ৬০০ টাকায় একটি প্রেস্ ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বরায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শাল সাহেবকে বলেন যে, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০ শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই

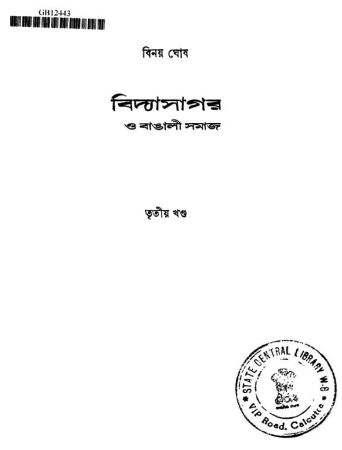

পরিশোধ হইবে।' সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত -পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় ক্রমশঃ ছাপাখানার ইষ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নিয়েই বিদ্যাসাগর মুদ্রক ও প্রকাশকের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ-পথে তাঁকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অনুগামী বলা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য মার্শাল সাহেব বইকেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ঠিক, কিন্তু কেবল সেই উৎসাহেই বিদ্যাসাগর 'অন্নদামঙ্গল' ছেপেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর আগে কেবল গঙ্গাকিশোর নন, আরও অনেকে 'অন্নদামঙ্গল' ছেপেছিলেন। ভারতচন্দ্র তখন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ঠিক ছাপাখানার আদিযুগে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল বলেই, কৃষ্ণনগরের রাজসভার বাইরে ভারতচন্দ্রের পক্ষে জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। পুথির যুগের রাজসভার স্তাবকদের গণ্ডির বাইরে তিনি জনসমাজে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার ও গানের একটা চাহিদা হয়েছিল তখন, বিশেষ করে তাঁর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্গত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের। প্রথম যুগের বাংলা পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রায় তাই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ছেপেছিলেন। বটতলার প্রকাশকরাও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যাংশের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং মার্শাল সাহেবের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পক্ষে অন্য বাণিজ্যিক যুক্তিও ছিল।

'অন্নঙ্গামঙ্গল' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানো হত এবং বিদ্যাসাগর যখন সেই কলেজের পণ্ডিত ছিলেন তখন তিনিই তা পড়াতেন। 'বিদ্যাসুন্দরের' উপাখ্যান পড়াতে তিনি রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করতেন। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সব বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি? এই কথা অমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।"

ছাত্রদের পড়াবার জন্যই যে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বিদ্যাসাগর, তা নয়। তাঁর রুচিবোধ সংযত হলেও, রুচিবায় ছিল না। সাহিত্যবোধ ও রসবোধ ছিল গভীর। বিদ্যাসুন্দরের খেউড় অংশ ছাত্রদের পড়াতে সঙ্কোচ হলেও, ভারতচন্দ্র তাঁর বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতা তিনি প্রায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন:

বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভকরেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা!'

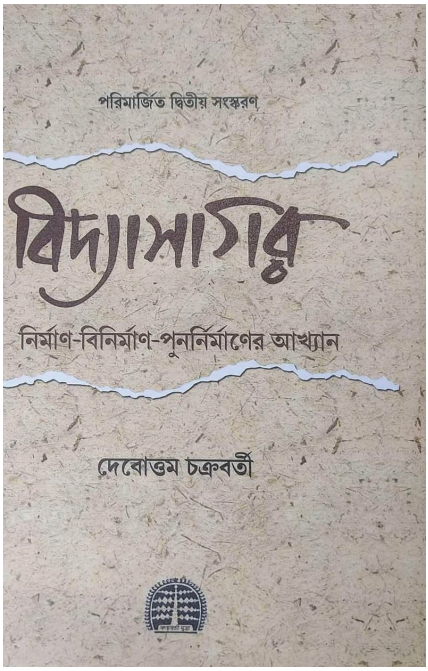

২

দেবোত্তম চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর, নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণের আখ্যান...

...উপরন্তু তাঁর [শিক্ষা সংস্কার] পরিকল্পনা পেশ করার প্রায় সাড়ে ৬ মাস পরে, বিদ্যাসাগর ইস্তফাপত্র দাখিল করেন। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে মার্শাল কেন তাঁর পরিকল্পনাটি সম্পর্কে মোয়াটের সঙ্গে আলোচনা করেননি; সেগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কেন কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি; বিদ্যাসাগরই বা কেন সরাসরি মোয়াটকে এ বিষয়ে জানাননি — সেসব প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিদ্যাসাগর-গবেষকই তাঁর পদত্যাগের জন্য রসময় দত্তকে অভিযুক্ত করেছেন। ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতামত অগ্রাহ্য করে একজন সামান্য বেতনভুক ভারতীয় কর্মচারী হিসাবে তিনি এই কাজ আদৌ

করতে পারেন কি না, সে বিষয়ে তাঁরা বিবেচনা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে পদত্যাগ করলেও একেবারে বেকার ছিলেন না বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক থাকাকালীনই তিনি বিকল্প উপার্জনের জন্য বাল্যবন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশনার ব্যবসায় যুক্ত হন। বিদ্যাসাগর স্বয়ং লিখেছেন: যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম। তবে পদত্যাগ করলেও একেবারে বেকার ছিলেন না বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক থাকাকালীনই তিনি বিকল্প উপার্জনের জন্য বাল্যবন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশনার ব্যবসায় যুক্ত হন। বিদ্যাসাগর স্বয়ং লিখেছেন:

> যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম।(*নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস*; গোপাল হালদার (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯)

সেই সময়ে তাঁদের দুজনেরই যথেষ্ট আর্থিক অসঙ্গতির কারণে নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে ৬০০ টাকা ধার নিয়ে তাঁরা সেই প্রেস কেনেন। পরে মার্শালের সহযোগিতায় তাঁদের সে ঋণ শোধ হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হাজির করে বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র জানান:

> এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ৬০০ টাকায় একটি প্রেস্ ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস্ ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বরায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যার্পন করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শেল সাহেবকে বলেন যে, "আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।" ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "বিদ্যার্থী সিবিলিয়ান্‌গণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ এক শতের মূল্য ৬০০ টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই

> পরিশোধ হইবে।" সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০ টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত-কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় ক্রমশ ছাপাখানার ইষ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত*, পৃ. ৮২-৮৩)

কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের উদ্ধৃতাংশটিতে প্রচুর তথ্যগত ফাঁক রয়ে গেছে। প্রথমত, বিদ্যাসাগরের অনুরোধ শোনা মাত্র মার্শাল বেছেবুছে *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রসঙ্গই তুলবেন; তাতে যে 'অনেক বর্ণাশুদ্ধি' আছে, সে কথা জানাবেন এবং ভারতচন্দ্রের আদি *অন্নদামঙ্গল* কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে আছে, সেই সন্ধানও তিনি জানবেন— সেসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগর ধার করে প্রেস প্রতিষ্ঠার কথা না বললেও মার্শাল অন্তর্যামীর মতো সে কথা জেনে যাবেন, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে এই বিষয়টিতে শম্ভুচন্দ্র সামান্য বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে ১৮৪৭ সালের ৭ জুন লিখিত চিঠিতে অন্নদামঙ্গল-এর বিষয়ে মার্শালকে অবহিত করেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মার্শালকে অনুরোধ করে তিনি লেখেন:

> Having fortunately obtained the author's manuscript and thinking it very desirable that there should be a *correct* edition of such a valuable production, I have the honour to state, should you be pleased to subscribe for 100 copies of the same that I shall be most happy to undertake to print. [নজরটান মদনমোহনের] ((Arabinda Guha (ed.), *Unpublished Letters of Vidyasagar*, p. 16))

চিঠিটির সঙ্গে বইয়ের আকার এবং দাম কত হবে তা জানিয়ে, এমনকি কাগজ ও ছাপার নমুনা পাঠিয়ে ১০০ কপি বইয়ের আগাম অর্ডার প্রার্থনা করেন তিনি। তবে মদনমোহনের এই চিঠি থেকে মনে হতে পারে, তিনিই যেন ১০০ কপি কেনার জন্য মার্শালকে প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের বয়ান থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তার সূত্রেই মদনমোহন মার্শালকে চিঠিটি লেখেন। চিঠি লেখার মাত্র একদিন পরে অর্থাৎ ৯ জুন, সরকার ৬০০ টাকা দিয়ে ১০০ কপি অন্নদামঙ্গল কেনার বিষয়ে সম্মতি জানায়। (তদেব, পৃ. ১৭) পরিহাসের কথা এই, মার্শাল যখন ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের জন্য বইটির ১০০ কপি কিনছেন, তখন কলেজে সে বই পড়া বা পড়ানোর মতো একজন ছাত্র কিংবা অধ্যাপকও নেই। শুধু তাই নয়, অচিরেই পুরনো কর্মক্ষেত্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদানের ক্ষেত্রে মার্শালের 'কৃপাদৃষ্টি' থেকে বঞ্চিত হন না বিদ্যাসাগর।

...প্রকৃতপক্ষে বাঙালি যে ব্যবসাকে হীন দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাজির করে প্রখ্যাত বিদ্যাসাগর-গবেষক বিনয় ঘোষ লেখেন:

> ...তবে তাঁর বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিদ্যাজীবীদের বাণিজ্যের পার্থক্য ছিল। তাঁরা বিত্তকে মূলধন ক'রে পণ্যের বাণিজ্য করেছিলেন বণিকদের মতো। বিদ্যাসাগর বিদ্যাকে মূলধন ক'রে তারই যুগোপযোগী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হিসাবে তিনি যে স্বাধীন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক স্বশ্রেণীভুক্তদের মধ্যে আর কেউ বিশেষ করেননি। (বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ১৬২)

আসলে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থব্যবসাকে অন্য আর পাঁচটা ব্যবসার থেকে আলাদা বোঝানোর জন্য, বিনয় ঘোষ গ্রন্থব্যবসার মূলধন হিসাবে বিত্তের পরিবর্তে বিদ্যার উল্লেখ করেন। কিন্তু কেবল বিদ্যাকে মূলধন বিবেচনা করে যে কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়, এই সামান্য কথাটি তিনি বিস্মৃত হন। এই অধ্যায়ে আমরা বিদ্যাবণিক বিদ্যাসাগরের সুলুকসন্ধানে উৎসাহী হব। তাঁর গ্রন্থব্যবসাকে মসৃণ রাখার জন্য তিনি কী কী উপায় অবলম্বন করেন, সেই প্রসঙ্গটিও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক, তখন বিকল্প উপার্জনের উপায় হিসাবে তিনি তাঁর সহপাঠী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশনার ব্যবসায় ব্যাপৃত হন। সেই সময়ে তাঁদের দুজনেরই যথেষ্ট আর্থিক অসঙ্গতি ছিল। সেই কারণে তাঁরা নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে ব্যবসার মূলধনরূপে ৬০০ টাকা ধার নেন এবং 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা কেনেন। মার্শাল ৬০০ টাকার বিনিময়ে সেই প্রেসে মুদ্রিত ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এর ১০০ কপি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য কেনার পরে, তাঁদের সেই ঋণ পরিশোধিত হয়। অথচ যে সময়ে মার্শাল *অন্নদামঙ্গল*-এর ১০০ কপি কিনছেন, তখন কলেজে সেই বই পড়ানোর মতো না আছেন শিক্ষক, না আছে ছাত্র। এমনকি ১৮৪৯-এর ১ মার্চ বিদ্যাসাগর যখন দ্বিতীয়বার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরিতে যোগদান করেন, তখন কলেজে মার্শাল ছাড়া হেড রাইটার ও ক্যাশিয়ার বিদ্যাসাগর এবং মুহুরি কালিদাস গুপ্ত ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি ছিলেন না। ফলে মার্শাল যে *অন্নদামঙ্গল*-এর ১০০ কপি কিনে বিদ্যাসাগরকে প্রকারান্তরে সন্তুষ্ট করেন মাত্র, এ কথা না বললেও চলে।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; চলতি পুথিতে উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি আলোচনা।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫ । ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব
জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা